Vol. 58 | No. 3 | 2023

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কালো বরফ : শৈশব রূপায়ণে জাদুবাস্তবতা

Volume	58
Issue	3
Year	2023
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Kanij Fatema
Published online	February 1, 2023
DOI	10.62328/sp.v58i3.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v58i3.9
Pages	১৪৩-১৫৮
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

কালো বরফ: শৈশব রূপায়ণে জাদুবাস্তবতা

Check for updates

কানিজ ফাতেমা বর্ণা

সাহিত্য পত্রিকা

Shahitto Potrika
eISSN 3006-886X
ISSN 0558-1583
Volume 58
Number 3

সাহিত্য পত্রিকা (২০২৩) ৫৮ (৩): ১৪৩-১৫৮
DOI 10.62328/sp.v58i3.9

সাহিত্য পত্রিকা
বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কালো বরফ: শৈশব রূপায়ণে জাদুবাস্তবতা

কানিজ ফাতেমা বর্ণা*

সারসংক্ষেপ: মাহমুদুল হক বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের আলোচনায় নির্বিকল্পভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস *কালো বরফ*-এর পাঠ বিশ্লেষণে জাদুবাস্তব অনুষঙ্গসমূহ কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা নির্ণয় করা বর্তমান আলোচনার মূল লক্ষ্য। এরূপ অন্বেষণের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে উপন্যাসটির শিরোনাম। ‘কালো বরফ’ তথা ‘ব্ল্যাক আইস’ শব্দবন্ধটি শীতপ্রধান দেশের নগর-ঘনিষ্ঠ একটি ধারণা যা বছরের তুষারপাত শুরুর পূর্বলগ্নে পিচঢালা রাস্তার ওপর হিম-জমা রংহীন অতিস্বচ্ছ ও পাতলা বরফের আস্তরণে পরিণত হওয়াকে নির্দেশ করে। এগুলোর রং নেই বলেই রাস্তার পিচের কালো রংকেই নিজের করে নেয়; কালো না হয়েও জাদুকরী আবহে দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় ‘কালো বরফ’ হিসেবে। আলোচ্য উপন্যাসে আবদুল খালেকের জীবনপথও কি তার ফেলে আসা স্বচ্ছ ক্ষণভঙ্গুর শৈশবস্মৃতিমাখা পোকাজীবন-জাত জাদুর আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখা আছে? পোকা না হয়েও যে-জীবন পোকার মতো! — এই জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে গিয়ে *কালো বরফ* উপন্যাসে জাদুবাস্তব তথা ম্যাজিক্যাল রিয়ালিজমের বিভিন্ন অনুষঙ্গের উপস্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। এ কারণেই বর্তমান আলোচনায় শিল্পতাত্ত্বিক প্রকরণ-উপায় হিসেবে জাদুবাস্তবতা মাহমুদুল হকের *কালো বরফ* উপন্যাসের ন্যারেটিভে কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা হবে।

সাহিত্যে জাদুবাস্তবতা: প্রেক্ষাপট ও প্রয়োগ

আধুনিক সাহিত্য-শিল্পে ব্যবহৃত ম্যাজিক্যাল রিয়ালিজম বা জাদুবাস্তবতা বহুল আলোচিত একটি শিল্প-উপায়। জাদুবাস্তববাদের প্রয়োগগত বিভিন্নতার দরুন একে একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞার্থে বেঁধে ফেলা দুরূহ। তবে অভিধাটির মধ্যে যে দ্বন্দ্বপূর্ণ বিরোধাভাস উঁকি দেয় তার প্রমাণ মেলে নিচের উদ্ধৃতিতে:

> One that suggests a binary opposition between the representational code of realism and that, roughly, of fantasy. In the language of narration in a magic realist text, a battle between two oppositional systems takes place, each working toward the creation of a different kind of fictional world from the other (Slemon, 1998 10)

অর্থাৎ, জাদুবাস্তবতা অভিধাটির মধ্যেই রয়েছে পরস্পরবিরোধী দুটি ধারণা — জাদু ও বাস্তবতা; আর জাদু ও বাস্তবতার বিরোধাভাসিত সহাবস্থানের মধ্যেই রয়েছে এই ভাবনার অভিনবত্ব। সাহিত্যে জাদুবাস্তবতা বলতে বোঝায়, বিশ্বাসযোগ্য ও বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবজগৎ-নির্ভর আখ্যানের ভেতর অবিশ্বাস্য, অতিপ্রাকৃত কিংবা অলৌকিক ঘটনার আশ্চর্য সামঞ্জস্যপূর্ণ শিল্পিত উপস্থিতি। জাদুবাস্তবতা লাতিন সাহিত্যিকদের লেখনীস্পর্শে বিশ্বব্যাপী

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সর্বাধিক পরিচিতি পেলেও প্রকৃতপক্ষে, জার্মান শিল্প-সমালোচক ফ্রানৎস্ রো-র চিত্রকলার সূত্র ধরে জার্মানিতে বিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকেই এই ধারণার সূত্রপাত ঘটে। চল্লিশের দশক থেকে মধ্য আমেরিকায় এবং মোটামুটিভাবে পঞ্চাশের দশক থেকে লাতিন আমেরিকায় জাদুবাস্তবতার বিস্তার ও জনপ্রিয়তা সূচিত হয়। অন্যদিকে আশির দশকে 'ম্যাজিক রিয়ালিজম', 'ম্যাজিক্যাল রিয়ালিজম' এবং 'মারভেলাস রিয়ালিজম' এই তিনটি পরিভাষা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হলেও তা শেষ পর্যন্ত 'ম্যাজিক্যাল রিয়ালিজম' পরিভাষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে স্থিত হয়।

জাদুবাস্তবতার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে বাস্তবের সঙ্গে বাস্তবাতিরেক, রহস্য, অতিপ্রাকৃত, আপাত-উদ্ভট, ফ্যান্টাসির মিশ্রণ ঘটানো; যেখানে জাদুকরী উপাদানগুলো পার্থিব বাস্তবানুগ পরিবেশে পাশাপাশি অবস্থানে থেকে প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃতের মেলবন্ধন সৃষ্টি করে। কৌশিক ত্রিবেদী তাঁর আলোচনায় জাদুবাস্তব কথাসাহিত্যের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে:

> In magic realism literature, there is a miscellaneous use of myths, legends, fairy tales, magic, ashtrology, mythology, spiritually and naturally religion. Elements of the human experience of reality are often emphasized on dream, imagination, sentience, feeling and emotion. (kaushik, 2013: 390)

অন্যদিকে, জে. এ. কুডন জাদুবাস্তব উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন আরও ব্যাপকভাবে:

> Some of the characteristic features of this fiction are the mingling and juxtaposition of the realistic and the fantastic or bizarre, skilful time shifts, convoluted and even labyrintuine narratives and plots, miscellaneous use of dreams, myths and fairy stories, expressionistic and even surrealistic description arcane erudition, the element of surprise or abrupt shock, the horrific and the inexplicable. (Cuddon, 1992: 522)

বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবকে অতিক্রম করে রূপকথা, স্বপ্ন, মিথ, লোকগাথা প্রভৃতিকে আশ্রয় করে মার্কেজের *One Hundred Year's* Of *Solitude* উপন্যাসে একদিকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও যৌন জীবনের বাস্তব বর্ণনা, অন্যদিকে বত্রিশ বছরের গৃহযুদ্ধ, পাঁচ বছর ধরে টানা বৃষ্টি, এক নারীর আকাশে উড়ে বেড়ানো, লেজসহ শিশুর জন্ম, তাকে পিঁপড়ের টেনে নেওয়া প্রভৃতি অদ্ভুত সব ঘটনার মধ্য দিয়ে উপন্যাসটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। কার্পেন্তিয়েরের The *Kingdom* of *This World* উপন্যাসে ১৮০০ সালের দাসবিদ্রোহের কথা বলতে গিয়ে উঠে আসে আফ্রিকান-আমেরিকান সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট; বিশেষত ভুডু সংস্কৃতির কথা, তাদের আকার বদলানো, মৃত্যুকালে ঊর্ধ্বলোকে গমন ইত্যাদি আশ্চর্য সব ঘটনা। শুধু বাস্তবতাকে অতিক্রমণের প্রয়াস থেকে নয়; বরং সমকালীন সামাজিক রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতাকে সাহিত্যে তুলে ধরতে জাদুবাস্তবতা অনেক সাহিত্যিকের কাছেই অত্যন্ত পছন্দনীয় শিল্প-উপায় হিসেবে গৃহীত হয়। বিশেষত ঔপনিবেশিক শাসনের কবলে পীড়িত দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোতে জাদুবাস্তবতার শিল্পদর্শন দিয়েছিল সমাজ

ও রাজনীতির উৎকেন্দ্রিকতাকে তুলে ধরার এক অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গি। উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ জাদুবাস্তববাদী লেখকের মাঝেই উত্তর-উপনিবেশিত শিল্পবীক্ষা সক্রিয় (Bowers, 2004: 7)। মূলত পশ্চিমা দেশসমূহ অন্যান্য দেশ-ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিপরীতে তাদের নিজেদের দৃষ্টিজাত সমাজ-রাজনৈতিক মানকেই নির্বিকল্পভাবে অনুসরণীয় বিষয় মনে করেছিল। এই প্রবণতার বিরুদ্ধে ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে ওঠে বিভিন্ন সাহিত্যিকের জাদুবাস্তব শিল্প-প্রকরণ ব্যবহারের প্রতি আগ্রহ। ফলে উত্তর-উপনিবেশিত প্রেরণার ন্যায় জাদুবাস্তববাদী উপন্যাসে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনাই মুখ্য হয়ে ওঠে। অন্যভাবে বলা যায়, জাদুবাস্তবতা উত্তর-ঔপনিবেশিক উপাদানকে নিজস্ব শিল্পকাঠামোয় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। কেননা মনে রাখা প্রয়োজন যে, জাদুবাস্তবতার শক্তির ভেতরে লুক্কায়িত আছে 'a concept of resistance to the massive impartial centre and its totalizing system' (Slemon, 1988: 10)। পাশাপাশি ইউরোপীয় ঔপন্যাসিক গুন্টার গ্রাসের *The Tin Drum*, টনি মরিসনের *Beloved*, সালমান রুশদির *Midnight's children* প্রভৃতি উপন্যাস বিবেচনা করলে এই সমাজ-রাজনৈতিক ভাবনাই রূপকাশ্রয়ী আখ্যানসূত্রে উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। দাসত্বের অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া কালো মানুষের পরিচয় পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বংশানুক্রমিক মিথের ব্যবহার মরিসনের উপন্যাসকে বিশেষ রাজনীতি-ঘনিষ্ঠ শিল্পমাত্রা প্রদান করেছে। এছাড়া রুশদির উপন্যাসে স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষের ত্রিশ বছরের কাহিনিতে রাজনৈতিক বিষয় রূপকী ধাঁচে তুলে ধরা হয়েছে। তবে কোনো মতবাদের বাঁধাধরা ছকের মধ্যে না থেকে সাহিত্যে এই বাস্তব ও বাস্তাবাতিরেককে মিলিয়ে দেওয়ার শিল্পকৌশল বহু আগে থেকেই সৃষ্টিশীল শিল্পীজনেরা ব্যবহার করে আসছেন। ইউরোপীয় কথাসাহিত্যের ইতিহাসে ফ্রানৎস কাফকার লেখায় বাগভঙ্গির মধ্যে জাদুবাস্তবতার পূর্বাভাস ছিল বলে মনে করা হয়। এক্ষেত্রে কাফকার *Metamorphosis*-এর আখ্যান বয়ন-কৌশল বিশেষভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। জোনাথান সুইফটের *Gulliver's Travels* এবং নিকোলাই গোগোলের *The Nose* উপন্যাসেও প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত একত্রীভূত হতে দেখা যায়। আলেহে কার্পেন্তিয়ার ল্যাটিন আমেরিকার পরিপ্রেক্ষিতে উত্থিত ফর্ম হিসেবে ম্যাজিক রিয়ালিজমকে ইউরোপীয় জাদু-বাস্তবময় পরিপ্রেক্ষিত থেকে আলাদা করেছেন। এই দুইয়ের বৈসাদৃশ্যকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে —

> Seeing Europe as a rational place where magic consisted of fairy-tale myths, he considered European magic realists to be creating a sense of mystery through narrative technique rather than cultural beliefs. (Bowers, 2004: 33)

কার্পেন্তিয়েের কাছে ইউরোপীয় জাদু-বাস্তবতাকে আসলে এক ধরনের 'Tiresome pretension' বা 'ক্লান্তিকর ভান' (1995: 89) বলে প্রতিভাত হয়েছে। একটি ভূখণ্ডের 'cultural context of production' (1995: 89) বা 'সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতগত উপাদান' হিসেবে জাদুবাস্তবতা যেভাবে ল্যাটিন আমেরিকার ন্যারেটিভে প্রবেশ করেছে, ইউরোপে তা সম্ভব হয়নি। ইউরোপীয় জাদুবাস্তববাদে তা রূপকথার পৌরাণিক কাহিনি হিসেবে গঠিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক বিশ্বাসের চেয়ে যা আসলে ন্যারেটিভ টেকনিকে (বর্ণনকৌশলে) এক ধরনের রহস্যময়তার বোধ তৈরি করেছে। অন্যদিকে ল্যাটিন আমেরিকায় জাদুবাস্তবতা

মূলত তাদের সাংস্কৃতিক বিশ্বাসের অংশ।

বিভিন্ন ধরনের অতিপ্রাকৃত অনুষঙ্গের ব্যবহার মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যেমন লক্ষণীয় তেমনি আধুনিক সাহিত্যেও এ ধরনের অনুষঙ্গ বিশেষ তাৎপর্যে উপস্থাপিত হতে দেখা যায়; যদিও বিভিন্ন কালের সাহিত্যে এসব অতিপ্রাকৃত উপাদান ব্যবহারে স্বতন্ত্র শিল্পলক্ষ্য বিদ্যমান ছিল। মঙ্গলকাব্য, রোমান্সমূলক প্রণয়োপাখ্যান, লোকসাহিত্য প্রভৃতি ধারায় অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত, অবাস্তব ঘটনা বিস্ময়কর আবহে উপস্থিত হয়ে থাকে। এসব কাব্যে মানুষের যাত্রাপথে অরি-শক্তিরূপে বিপদ-বিপত্তির সৃষ্টি, আত্মা-প্রেতাত্মার ধারণা থেকে প্রেতলোকের চিন্তা, ভয়ংকর বীভৎস প্রাণীদের কথা, মন্ত্রগুণে মানবদেহ পাখিতে রূপান্তরিত হওয়া, আবার পশুপাখির মধ্য দিয়ে মানবের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা, অধ্যাত্ম শক্তিবলে অলৌকিক ঘটনার আরোপ, ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়াই পরস্পরের মানসিক সংযোগ বা টেলিপ্যাথি প্রভৃতি ঘটনা বাস্তবের সীমা অতিক্রম করে যায়। আধুনিক যুগে এসেও বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্সের জগৎ তৈরি করে বাস্তবকে বাস্তবাতিরেকের আবরণে ঢেকে দিতে আগ্রহী হন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই অতিপ্রাকৃতের জগৎকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রায় স্পর্শ করেন তাঁর ‘কঙ্কাল’, ‘ক্ষুধিত পাষাণ’ প্রভৃতি গল্পে। ‘কঙ্কাল’ গল্পে বাস্তব এবং অতিপ্রাকৃতের সম্মিলনে একটি আধিভৌতিক সময়কে নির্মাণের প্রয়াস লক্ষ করা যায়:

> নিশ্চয় বুঝিতে পারিলাম সমস্তই আমারই নিদ্রাহীন উষ্ণ মস্তিষ্কের কল্পনা এবং আমার মাথার মধ্যে বোঁ বোঁ করিয়া যে রক্ত ছুটিতেছে। কিন্তু তবু গা ছম ছম করিতে লাগিল । জোর করিয়া এই অকারণ ভয় ভাঙিবার জন্য বলিয়া উঠিলাম, “কেও!” পদ শব্দ আমার মশারির কাছে আসিয়া থামিয়া গেল এবং একটি উত্তর শুনিতে পাইলাম, আমি। আমার এই কঙ্কালটা কোথায় গেছে তাই খুঁজতে আসিয়াছি। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬: ৩২১)

রবীন্দ্র-পরবর্তীকালে বিভিন্ন সাহিত্যিকের রচনায় বিশেষত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *হাঁসুলি বাঁকের উপকথা* (১৯৪৭) উপন্যাসে কাহার সম্প্রদায়ের ও বাবা ঠাকুরের বাহন চন্দ্রবোড়া সাপের মিথ ও অলৌকিকত্বের ব্যবহারে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পুতুল নাচের ইতিকথা* (১৯৩৬) উপন্যাসে রথযাত্রার দিনে যাদব পণ্ডিতের ইচ্ছামৃত্যুর বাস্তবতা-উৎকেন্দ্রিক ঘটনা; নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘বীতংস’, ‘হাড়’ প্রভৃতি ছোটগল্পে ঔপনিবেশিক শোষণকে নির্দেশ করতে রূপকাশ্রয়ী ধাঁচে উপস্থাপিত জাদু, মন্ত্র-তন্ত্রের কথা কিংবা শওকত ওসমানের *পতঙ্গ পিঞ্জর* উপন্যাসে গ্রামে পোকার আক্রমণ ও গ্রামবাসীর প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাস্তবতাকে তুলে ধরার কৌশল বাংলা সাহিত্যে অতিপ্রাকৃত অনুষঙ্গ ব্যবহারের ঐতিহ্যিক ধারাবাহিকতাকে তুলে ধরে। তবে উল্লিখিত এসব রচনায় লাতিন আমেরিকার সাহিত্যসদৃশ জাদুবাস্তববাদের কোনো সচেতন প্রয়োগের কোনো লক্ষ্য ছিল না। বস্তুত জাদুবাস্তববাদের বিশিষ্ট প্রয়োগ লক্ষ করা যায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়াবনামা*, শহীদুল জহিরের *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা*, *মুখের দিকে দেখি*, *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল*, নাসরিন জাহানের *চন্দ্রের প্রথম কলা*, *চন্দ্রলেখার জাদুবিস্তার*, *সোনালী মুখোশ*, *উড়ে যাওয়া নিশিপক্ষী*সহ বিভিন্ন উপন্যাসে। এ সকল উপন্যাসে বাস্তব ও

অলৌকিকের সম্মিলন; রূপকথা, স্বপ্ন, মিথ, লোককথা প্রভৃতি সংরূপ-আশ্রয়ী ঐন্দ্রজালিক উপস্থাপনা লক্ষণীয়। ইলিয়াসের *খোয়াবনামাতে* লোককথায় রচিত মুনসি বয়তুল্লাহ শাহের কাহিনির মধ্য দিয়ে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ থেকে তেভাগা আন্দোলন প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়ে অতীত ইতিহাসের নানা অভিঘাত, অতিলৌকিক দৃশ্য নির্মাণের মধ্য দিয়ে কুলসুমের ওপর কালাম মাঝির যৌন নিপীড়ন, তমিজের বাপের রহস্যময় উপস্থিতি প্রভৃতি ঘটনা জাদুবাস্তব আবহ সৃষ্টির উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত শহীদুল জহিরের *জীবন* ও *রাজনৈতিক বাস্তবতা* উপন্যাসে বদু মওলানার কাকের জন্য মাংস ছড়ানোর কাহিনি; *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল* উপন্যাসে মফিজুদ্দিনের আততায়ীর হাতে সপরিবার নিহত হওয়ার ঘটনা নিয়ে গ্রামবাসীর আলাপচারিতায় মফিজুদ্দিনের একশ এগার বছর বেঁচে থাকার কাহিনি ও তার মায়ের কাহিনির মধ্য দিয়ে পাঠকের অতীত থেকে অতীতে বিচরণ কিংবা নাসরিন জাহানের *চন্দ্রলেখার জাদুবিস্তার*-এ রূপকথার আবহে রচিত স্বৈরশাসন-পরবর্তীসময়ের বাস্তবতাকে তুলে ধরা, *চন্দ্রের প্রথমকলাতে*ও একইভাবে রূপকথার আবহ নির্মাণ, উড়ে যায় নিশিপক্ষীতে তিন বুড়ির কাহিনি, চন্দ্রানীর উপকথা, কাঁসা দিঘির কাহিনি ইত্যাদি ঘটনা অলৌকিকতার আবহ সৃষ্টি করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অমিয়ভূষণ মজুমাদার রচিত *মহিষকুড়ার উপকথা* উপন্যাসে মহিষকুড়ার বনে গিয়ে আসফাকের বাইসনে পরিণত হওয়ার জাদুস্পর্শী ঘটনা যা আলোচ্য শিল্প-প্রকরণ ব্যবহারের এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত:

> কিছুদূর গিয়ে আসফাকের মনে হল, সে যেন একটা মাদী মোষের পিঠে শুয়ে আছে আর মোষটা ঘাস খেতে খেতে হাঁটছে। তা মাদী মোষের পিঠে শুতে প্রথম ভয় করেই। ... সে তাড়াতাড়ি চলতে লাগল । আর সেই অবস্থায় গাছের পাতার ছায়া যেমন তার গায়ের উপরে ছায়ার ছবি আঁকছিল, তার মধ্যেও ভয় আর সাহস, আনন্দ আর উত্তেজনা, নানা রেখা এঁকে নাচতে থাকল। সে এবার আরও জোরে আরও টেনে আ-আ-আ-ড় শব্দ করে উঠল। (অমিয়ভূষণ, ২০০৮: ২৪৮)

এভাবে হঠাৎ করে বাস্তবের সীমানা ছাড়িয়ে ন্যারেটিভের ভেতরে রূপকথা, স্বপ্ন, মিথ, লোককথার বিবিধ অনুষঙ্গ জাদুবাস্তব কৌশলে ব্যবহৃত হচ্ছে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে। এ ধরনের জাদুবাস্তব উপাদান আলোচ্য *কালো বরফ* উপন্যাসেও অনুসন্ধান করে দেখা যেতে পারে। তবে এর সম্যক অনুধাবনের জন্য মাহমুদুল হকের ঔপন্যাসিক মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা প্রয়োজন ।

ঔপন্যাসিক মনস্তত্ত্ব

সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্যে মাহমুদুল হকের আবির্ভাব বিকাশ ও পরিণতি একজন ব্যতিক্রম-চিহ্নিত প্রতিভাধর শক্তিমান লেখক হিসেবে। বিরল দক্ষতায় তিনি কথাসাহিত্যে গড়ে তোলেন তাঁর নিজস্ব ভুবন। ১৯৪১ সালে পশ্চিমবঙ্গের বারাসাতে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। দেশভাগের অভিজ্ঞতায় দগ্ধ শৈশব নিয়ে ১৯৫০ সালে স্থায়ীভাবে তিনি পূর্ববাংলায় চলে আসেন। মাহমুদুল হকের বেড়ে ওঠার ক্রমধারাবাহিকতার সমান্তরালে এদেশে রাজনৈতিক অঙ্গনে যে অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছিল; দেশভাগ থেকে শুরু করে

মুক্তিযুদ্ধকালীন বাস্তবতা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সামাজিক জীবনে যে স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ, অবসাদ-ক্লান্তি-হতাশা-নৈরাজ্য-বিষাদ এনেছিল তাকেই তিনি *জীবন আমার বোন* (১৯৭৬), *খেলাঘর* (১৯৭৮), *কালো বরফ* (১৯৯২), *পাতালপুরী* (২০০৯) প্রভৃতি উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। তবে তাঁর কোনো উপন্যাসেই প্রত্যক্ষ রাজনীতি বা রাজনীতি সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি প্রধান হয়ে ওঠেনি। বরং রাজনীতিকে কেন্দ্র করে সমাজের ভাঙন, ব্যক্তির সংকট ও অসঙ্গতিকে তিনি সর্বদা শিল্পিতভাবে তুলে ধরতে সচেষ্ট থেকেছেন। কেননা রাজনৈতিক ঘটনা ব্যক্তি-হৃদয়ে কী প্রভাব ফেলেছে তার বিশ্লেষণেই তিনি অধিক মনোযোগী ছিলেন। অর্থাৎ বলা যায়, বহির্বাস্তবতার চাপে স্পৃষ্ট অন্তর্বাস্তবতাকে তুলে ধরতে প্রয়াসী ছিলেন মাহমুদুল হক। আর এক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতে জীবনের জটিলতা সন্ধানে ব্যক্তির অন্তঃসারশূন্যতা অধিক স্থান পেয়েছে তাঁর উপন্যাসে।

উল্লিখিত শিল্প-প্রবণতা আলোচ্য উপন্যাসেও লক্ষণীয়। দ্বিজাতিতত্ত্ব ভিত্তিক দেশভাগের প্রেক্ষাপটে লেখা কালো বরফ উপন্যাসে সময়সাময়িক ঘটনার কিছু ইঙ্গিত লেখক দিলেও এতে রাজনৈতিক ঘটনা মুখ্য হয়ে ওঠেনি। বরং দেশভাগ পরবর্তী সাধারণ মানুষের উন্মূলিত সত্তার যন্ত্রণা ও তার করুণ পরিণতিকে তিনি শৈল্পিকভাবে পোকা-শৈশব পেছনে ফেলে আসা আবদুল খালেক নামক একজন মাঝারী মানুষের চরিত্র চিত্রণের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেন। এই উপন্যাসের কাহিনি বাস্তবানুগ এবং প্রতিটি চরিত্রই বাস্তব পৃথিবী থেকে নেওয়া। উপন্যাসে আবদুল খালেক, রেখা, পোকা, মা, মনি ভাইজান, নরহরি ডাক্তার, টিপু ভাইজান, কেনারাম কাকা, ছবি দি, গিরিবালা, মাধুরী সকলেই বাস্তব জগতের বাসিন্দা। আর এসকল চরিত্রকে আরও বাস্তব রূপ দিতে চরিত্রানুযায়ী ভাষা নির্মাণ করেছেন ঔপন্যাসিক। এজন্য তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি আঞ্চলিক, লৌকিক, কখনও-বা পরিবেশগত বাস্তবতায় নাগরিক ভাষায় কথা বলে। উপন্যাসের ভাষা কৃত্রিমতাবর্জিত ও সাবলীল। সম্পূর্ণ মেদমুক্ত নির্ভার ভাষায় তিনি তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন যেন 'পাহাড়ের একটি ছোট জলধারা সামনের ছোট-বড় পাথর-সাম্রাজ্য পার হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তার সুরভিত গদ্য এমনই নাটকীয় এবং সঞ্চারী।' (রবিউল, ২০১০: ১০৩)।

পোকাজীবনের আখ্যান

কালো বরফ উপন্যাসের আখ্যান নির্মাণের বৃহত্তর অংশ জুড়ে আছে আবদুল খালেকের শৈশবস্মৃতি। এক্ষেত্রে উপন্যাসটির গঠন কৌশল একটি বিশিষ্টমাত্রায় উত্তীর্ণ হয় যেখানে একজন ব্যক্তিমানুষের দুটি সত্তাকে ঔপন্যাসিক তুল্যমূল্যে উপস্থাপন করেন একটি পোকা সত্তা, অন্যটি আবদুল খালেক সত্তা। উপন্যাসের মূল চরিত্র আবদুল খালেক তার ডায়েরিতে যে শৈশবস্মৃতি অর্থাৎ পোকার সত্তার কাহিনি লিখেছেন তা উপন্যাসে প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম পরিচ্ছেদে উপস্থাপিত হয়েছে। অন্যদিকে, দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে পোকারূপী আবদুল খালেকের বর্তমান জীবন-যন্ত্রণার কাহিনি। ফলে বর্তমান যন্ত্রণাময় জীবন থেকে আবদুল খালেকের শৈশবস্মৃতিচারণের সূত্র ধরে লেখক বাস্তবজীবন থেকে সরে বাস্তবাতিরেকে চলে যান। আর তখন তাঁর আশ্রয় হয়

জাদুবাস্তব কাঠামো। উপন্যাসে পোকাসত্তার কাহিনির মধ্যে রূপকথা, লোকগাথা, মিথ অবলম্বনে উঠে আসে আশ্চর্যসব ঘটনা। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য:

> পোকার শৈশবজগৎ এবং মাছ-পাখির মতো প্রাকৃতিক বিষয় একাকার হয়ে গেছে লৌকিক-অলৌকিক আরো অনেক কিছুর সঙ্গে, তার শিশুসুলভ কল্পনার বাস্তব-অবাস্তব মিশে গেছে, এ এক চমৎকার পরিবেশ সৃষ্টিক্ষমতা মাহমুদুল হকের। যাদুবাস্তবতার কথিত ধারণার সঙ্গে এর মিল। কিন্তু এ তার চেয়েও বেশি এবং ভিন্ন কিছু। (হরিশংকর, ২০১০: ১৬৩)

উপন্যাসে এই বাড়তি ও ভিন্ন কিছুর প্রকাশে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে আব্দুল খালেকের বর্তমান জীবনযন্ত্রণার কাহিনি। যদিও উপন্যাসে পোকার শৈশব জীবন, দস্যি ছেলে মনি ভাইজান, পুঁটি, পাচু, ঝুমি, মিত্তির বাড়ির মেয়ে ছবিদি, শনপাপড়ি, কুলপি মালাইওয়ালা, চিনাবাদামওয়ালা, কেনারাম কাকা, মা মিলে তার চারপাশের জগৎটাকে আনন্দঘন করে তোলে; পুঁটির মাছ-পাখির সাথে কথা বলা, মনি ভাইজানের কাছ থেকে জাদু-মন্ত্র-তন্ত্র শেখা, শালিক পাখির সাথে কথা বলা, কাগজের নৌকা বানানো, জলে ভাসমান পিঁপড়ের পাশে লাইফ বোট হিসেবে শুকনো পাতা ছেড়ে দেওয়া, বাড়িতে আগত সাধুর মন্ত্র-তন্ত্র জানা সব মিলিয়ে পোকার জীবনটা অদ্ভুত এক মায়ার জগতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। উপন্যাসে এসব ঘটনা থাকলেও পোকারূপী আবদুল খালেকের জীবনকে বাস্তববাদী ন্যারেটিভের ধাঁচে তুলে ধরে লেখক ব্যক্তি-হৃদয়ের মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকে রূপ দিয়েছেন অপরিসীম সমানুভূতির সঙ্গে। কেননা দেশভাগের পটভূমিতে ব্যক্তিচিত্তের উন্মোচনই লেখকের অন্বিষ্ট; জন্মভূমি, পোকার শৈশবস্মৃতির জন্য আবদুল খালেকের ভেতরকার যে যন্ত্রণা তার স্বরূপ প্রকাশই ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য। এজন্য উপন্যাসে আবদুল খালেক চরিত্রটিকে সর্বদাই শৈশবস্মৃতির জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকতে দেখা যায় —

> তখন তো কিছু বুঝতাম না, একটা শালিক পাখির জন্য কি হাহাকারটাই না ছিলো বুকের ভেতর, একদিন দেখা না পেলে সবকিছুই মিথ্যে হয়ে যেত, একটা ভাঙা কাচের শেকলকে কতো যত্নেই না লুকিয়ে রেখেছি। এখন কাচের সেই শেকল গলায়, না পারি খুলতে, না ফেলতে, খুলতে গেলে যদি গলা কেটে যায়। (মাহমুদুল, ২০১০: ১২৫)

উপন্যাসের প্রথমে এই চরিত্রটিকে সংসার-সীমার মাঝে থেকেও নিঃসঙ্গ এবং প্রাত্যহিকতার প্রতি চরম নির্লিপ্ত করে লেখক উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু সমাপ্তি অংশে অর্থাৎ ‘আলো- ছায়ার যুগলবন্দি’ শিরোনামাংশে লেখক খালেকের সমস্ত উদাসীনতা ও যন্ত্রণার জট খুলে দেন। দেশভাগের ফলে জন্মভূমি থেকে, নিজের শৈশব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক মর্মন্তুদ যন্ত্রণাময় পরিস্থিতি কুঁকড়ে খায় আবদুল খালেকের ভেতরটাকে। দেশভাগের সূত্র ধরে জন্মভূমি থেকে উন্মূলিত হয়ে শৈশব অর্থাৎ পোকা সত্তার সাথেও মিলতে পারছে না খালেক; যেখানে ছিল তার মনি ভাইজান, ছবি দি, মা, গিরিবালা, মাধুরী, কেনারাম কাকা প্রমুখ। এই মিলতে না পারার দরুন তার ভেতরকার যে যন্ত্রণা তাকে সাময়িকভাবে প্রশমিত করে স্ত্রী রেখার আলিঙ্গন। কিন্তু জন্মভূমি ও শৈশবস্মৃতির রিপ্লেসমেন্ট হয় না কোনোভাবেই। তবু বর্তমানের এই যন্ত্রণাকাতর পরিস্থিতিতে শৈশবস্মৃতিই তাকে বাঁচিয়ে রাখে —

> বুকের ওপর দু'টো হাত জড়ো করে মার খাওয়া মানুষ, যখন বলে মুঠোয় কি আছে দেখতে চেয়ো না, দোহাই তোমাদের কোন কাজে লাগবে না, সারা জীবনের সঞ্চয় শুধু এইটুকুই, এই সামান্য স্বপ্নটুকুই, তখন ধরে নিতে হয় সে বেঁচে আছে কেবল স্মৃতির ভেতর। তার চেয়ে নির্বিষ, তার চেয়ে নিরাপদ জানোয়ার আর কে! (মাহমুদুল, ২০১০: ১১১)

মানুষের বেঁচে থাকার আর কোনো অবলম্বনই যখন অবশিষ্ট থাকে না তখন মানুষ স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। পোকা জীবন থেকে যখন সেই 'চার ভাঁজ-করা ছবি, তেশিরা কাচ, লালকুঁচ' হারিয়ে ফেলেছে তখন স্মৃতিতেই সেসবের সন্ধান মেলে; স্মৃতিতে ভেসে আসা সেই মাছ-পাখির প্রাকৃতিক পরিবেশেই খালেক প্রাণ ফিরে পায়। তাই উপন্যাসের শেষদিকে চিত্রিত এমন একটি প্রাকৃতিক পরিবেশে এসে খালেককে অনেক বেশি উন্মুক্ত হতে দেখা যায়। এর মধ্য দিয়ে 'বর্তমানেরই এক আনন্দঘন পরিবেশ চিত্রিত হয়েছে। এ রূপ পরিবেশ রচনার মধ্য দিয়ে লেখক বলতে চান, এমন জীবনই তার কাম্য, এ রূপ জীবনই সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর' (সৈয়দ আজিজুল, ২০১০: ১৩৯)। নদী-বন-গাছপালা-পাখি সংবলিত একটি প্রাকৃতিক পরিবেশে গিয়েই খালেক রেখার কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করে দেয়, ভেতরের অব্যক্ত যন্ত্রণা প্রকাশ করে; নদীর ধারে একটা ঝোঁপঝাড়ের মধ্যে তাদের প্রেমময় শারীরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আর এটা সম্ভব হয়েছে প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে যে প্রকৃতির সাথে শৈশবে পোকার মাছ-পাখির যে প্রাকৃতিক পরিবেশ তার সাযুজ্য রয়েছে। অর্থাৎ এমন একটা পরিবেশই সে খুঁজে ফেরে। শুধু শৈশবের প্রাকৃতিক পরিবেশ নয়, শৈশবের সেই প্রতিবেশে হারিয়ে যাওয়া মুখ গিরিবালা, মাধুরীকে সে সন্ধান করে চলে স্ত্রী রেখার মধ্যে।

সুতরাং নিছক নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত নয় আবদুল খালেক। দেশভাগের পটভূমিতে সমাজ-সংসার ছেড়ে বিবিক্ততায় আক্রান্ত আবদুল খালেক ভেতরের যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য হাতড়ে বেড়ায় শৈশবের দিনগুলোকে। বর্তমান ব্যর্থ জীবনের অজস্র যন্ত্রণাময় বাস্তব কাঠামোকে অতিক্রম করতে চায় খালেক। আর এক্ষেত্রে শৈশবে প্রত্যাবর্তন করার ইচ্ছার মধ্য দিয়ে জাদুবাস্তব কাঠামোতে চলে যান লেখক, অনেক ক্ষেত্রেই যা লাতিন আমেরিকার জাদুবাস্তব সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে। মার্কেজ তাঁর *One Hundred Year's Of Solitude* উপন্যাসে গড়ে তোলেন এমন এক আখ্যান-কাঠামো যেখানে শৈশবস্মৃতি রোমন্থনে উঠে আসে আপাত-উদ্ভট ও আজব সব জাদুর ঘটনা। এ উপন্যাসটি মূলত এক পারিবারিক সাগা; যেখানে বোয়েন্দিয়া পরিবারকে কেন্দ্র করে ভুতুড়ে বাড়ি, কুসংস্কারের বাতাবরণে তৈরি হয় জাদুর গল্পমালা। *কালো বরফ* উপন্যাসেও রয়েছে স্মৃতি রোমন্থনের আবহ। বর্তমান জীবনের ব্যর্থ দিনগুলোকে আড়াল করতে খালেক পোকা জীবনের মধ্যে যেতে চায়। কারণ, পোকা জীবন তাঁর কাছে অনেক বেশি আনন্দময়। এই নামের মধ্য দিয়ে খালেক উপলব্ধির জায়গায় পৌঁছে যায়, বাস্তবাতিরেকে চলে যায়। খালেকের মনস্তত্ত্বের মধ্যে পোকাই তখন অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, পোকা কোনো স্বাভাবিক বাল্য-নাম নয়। পোকা নাম পাঠককে অন্য একটি ভাবনার মধ্যে ফেলে দেয়। কেন এমন একটি নাম লেখককে বেছে নিতে হলো? পোকা নামেরই-বা তাৎপর্য

কোথায়? পোকা তো অবপ্রাণী, ক্ষুদ্র অমেরুদণ্ডী কীট। এই নাম যখন উপন্যাসে এত গুরুত্ববহ হয়ে ওঠে তখন পাঠকের মধ্যে অনিবার্যভাবেই কৌতূহল জাগে। কিন্তু পোকার বাবার বন্ধু কেনারাম কাকার দেওয়া এই নামটি নিয়ে লেখক খুব বেশি ব্যাখ্যার তাগিদ অনুভব না করে একটি বাক্যেই বলে দেন 'কেনারাম কাকাই জানেন আমার নাম পোকা দিয়েছিলেন কেন?' এর মধ্য দিয়ে হয়তো লেখকের বক্তব্য শেষ হয়ে যায় কিন্তু পাঠকের ভাবনা জেগে থাকে। উপন্যাসে পোকার নামকরণের আপাত রহস্য ও বিস্ময় স্মরণ করিয়ে দেয় ফ্রানৎস কাফকার *Metamorphosis*-এর কথা। এ গ্রন্থে স্বপ্নের ঘোর লাগা নয়; বরং স্বপ্ন ভেঙে জেগে ওঠা একটি চরিত্রের আধিভৌতিক সময়কে নির্মাণ করেছেন লেখক। এক সকালে অস্বস্তিকর স্বপ্ন থেকে জেগে গ্রেগর সামসা দেখে সে এক দৈত্যাকার পোকায় পরিণত হয়ে আছে। কিন্তু তার সমস্ত ভাবনা-চিন্তা, আবেগ-অনুভূতি একজন মানুষের অর্থাৎ গ্রেগর সামসার। যে ছিল সংসারে একমাত্র আয়ের উৎস, পোকায় পরিণত হওয়ায় সংসার থেকে তার প্রয়োজনীয়তাও হারিয়ে যায় এবং শেষে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে। এই পুরো কাহিনি জুড়ে যে জাদুবাস্তব আবহ বিদ্যমান তা স্মরণে রেখে ধারণা করা যেতেই পারে যে, কাফকা হয়তো মাহমুদুল হককে নানাভাবেই অনুপ্রাণিত করেছিলেন। কাফকার উপন্যাসে পোকার জীবনের চরম পরিণতি অঙ্কন করা হয় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। কিন্তু কালো বরফ উপন্যাসে দেশভাগের নির্মম বাস্তবতার কারণে হৃত-শৈশব আবদুল খালেকের পোকাসত্তার চেতনগত মৃত্যু ঘটে; শৈশবের আনন্দময় দিনগুলো মুছে গিয়ে আবদুল খালেকের জীবন নিজের কাছে হয়ে ওঠে অসহনীয় — যা হয়তো মৃত্যুরও অধিক।

প্রকরণে জাদুবাস্তব অনুষঙ্গ

নস্টালজিয়া তথা অতীত স্মৃতিকাতরতা এবং এর মধ্য দিয়ে ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা উত্তর-উপনিবেশবাদী সাহিত্য প্রকরণের একটি বৈশিষ্ট্য। বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, জাদুবাস্তব শিল্পপ্রকরণও উত্তর-উপনিবেশবাদী সাহিত্যের ন্যায় ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে। আবদুল খালেকের নস্টালজিক হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে *কালো বরফ* উপন্যাসে উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়ে। এ উপন্যাসে লেখক শৈশবের পোকাসত্তার মধ্য দিয়ে হারিয়ে যাওয়া মানুষের টুকরো কথা, স্বর অথবা অন্তর্গত ইতিহাসকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছেন। পোকা চরিত্রকে কেন্দ্র করে উপন্যাসে পুঁটি, মা, সাধু, ভিক্ষুক প্রভৃতি চরিত্রের মধ্য দিয়ে উঠে আসে গ্রামীণ সংস্কৃতি ও বিশ্বাস চর্চার কথা।

জাদুবাস্তব উপন্যাসে রাজনৈতিক ক্ষমতাবঞ্চিত মানুষের জীবনভাবনা প্রাধান্য পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রেক্ষাপটে রচিত অনেক জাদুবাস্তব উপন্যাসে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী রাজনৈতিক ভাবনাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। তবে এক্ষেত্রে লেখকগণ প্রায়শই প্রতীকী চিত্রকল্পের আশ্রয় গ্রহণ করেন। *কালো বরফ* উপন্যাসটি অবশ্য সরাসরি ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে গিয়ে লেখা হয়নি; তবে একথাও তো অস্বীকার করার উপায় থাকে না যে, সাতচল্লিশের দেশভাগ ঔপনিবেশিক রাজনীতিরই ফল। এ কারণেই মাহমুদুল দেশভাগের পটভূমিতে সমাজের ভাঙন এবং ব্যক্তির যন্ত্রণাকে তুলে ধরেন এভাবে:

> ক্যাঁ ক্যাঁ করে শালিকটা ডাকার পর পুঁটি বললে, 'দেখেছ দেখেছ, কি বজ্জাত! আমাকে নচ্ছার বলে গাল দিল। পাকিস্তান চায় বলে হিন্দু পাখিরা নাকি ওর ঠ্যাং ভেঙে দিয়েছে, শোন কথা! তা আমার কি দোষ বলো? ঐ শোন আবার কি বললে! বলছে, তোমার জাতভেয়েরা তো করেছে। (মাহমুদুল, ২০১০: ৪৭)

এখানে প্রতীকী প্রয়োগের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলিম বিরোধের জায়গাটাকে তুলে ধরে লেখক দেশভাগের বাস্তবতাকে চিহ্নিত করেছেন। যেহেতু স্বপ্ন, মিথ, রূপকথা, লোককথার নানাবিধ ব্যবহার জাদুবাস্তব সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, সেহেতু *কালো বরফ* উপন্যাসের পোকাসত্তার আশ্রয়ে অনুরূপ প্রবণতার ব্যবহার লক্ষণীয়।

আত্মার রূপান্তর (Transformation of soul) লোকবিশ্বাসের একটা উল্লেখযোগ্য মোটিফ। *কালো বরফ*-এ পোকার শালিক পাখির সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়া এবং মনি ভাইজানের কাছ থেকে যখন জানতে পারে যে, এই শালিক পাখিই তার বোন তুলির প্রতিরূপ যে 'মরে পাখি হয়ে গেছে। আমরা তো ভাই, তাই আমাদের মায়া কাটাতে পারে না' — তখন থেকে পোকার যে আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ তা বাস্তবের সীমার বাইরে গিয়ে এক ভিন্ন চেতনাশ্রয়ী অধিবাস্তবকে পাঠকের সম্মুখে উন্মোচন করতে সচেষ্ট হয়। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়:

> তারপর থেকে আমার একটাই কাজ, মাটির খুরিতে ভাত আর মাছ নিয়ে ফলশা গাছের পাশে সারা দুপুর বসে থাকা। বসে বসে কাঁটা বেছে মাছ-ভাত খাওয়াতাম। শুধু ভয় হতো, এই বুঝি কাঁটা বিধল গলায়। জিগ্যেস করতাম, 'তোমার কষ্ট হয়?'
> 'শীত লাগে না?'
> 'লেপের ভেতর শুতে চাও?'
> 'মা তোমার জন্য এখনো কাঁদে '
> সব কথার একটাই জবাব ছিল তার, ক্যাঁ ক্যাঁ। রাগ হতো নিজের ওপর। ও-তো সব বলে, ওর সব কথা; সব দুঃখ, সব কষ্ট সবকিছুর কথা। কেবল আমি এমন গাধা যে, তার এক বর্ণও বুঝি না। (মাহমুদুল, ২০১০: ৪৬)

আত্মার রূপান্তরের সূত্র ধরে উপন্যাসে বিভিন্ন ঐতিহাসিকভাবে নিন্দিত চরিত্রের নামও এসেছে, যার মধ্য দিয়ে মিথের ধারণা মনি ভাইজানের দৃষ্টিকোণ থেকে এক নতুন উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হয় —

> মীরজাফর মরে কি পাখি হয়েছে জানিস, শকুন।'... এক একটা মানুষ মরে গিয়ে এক একটা শকুন হয়েছে। লর্ড ক্লাইভ, জগৎশেঠ, উর্মিচাঁদ, ওয়ারেন হেস্টিংস, নাদির শাহ, তৈমুর লং, ছবির ঠাকুম মরার পরে ওরা সকলেই তো শকুন হয়েছে। (মাহমুদুল, ২০১০: ৭১)

মানুষ মরে গিয়ে পাখি হয়, কিন্তু সেই পাখির মধ্যেও রকমফের আছে। এক ধরনের কূটাভাসের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের শোষকরূপী শাসকদের শকুনরূপে প্রতীকায়িত করেছেন লেখক।

মাহমুদুল হকের উপন্যাসে রূপকথা বা লোককথার ব্যবহার মারফত উঠে এসেছে লোকবিশ্বাস, জাদু, মন্ত্র-তন্ত্রের কথা যা কাহিনিপ্রবাহ ও চরিত্রায়ণ প্রক্রিয়াকে এক অদ্ভুত শিল্পকাঠামো প্রদানে উৎসাহী হয়। মনি ভাইজানের মতো জীবনোদ্যম, রসিক, সর্বদা আনন্দোচ্ছল চরিত্রের স্বভাবের সঙ্গে লেখক অনায়াসে সমন্বিত করেন জাদু-মন্ত্র-তন্ত্রের প্রসঙ্গ। পোকার সাথে তার কথোপকথনে উঠে আসে জাদু-মন্ত্র-তন্ত্রের কথা —

> মন্ত্রের জোরে আমি যেকোন লোককে চোখের পলকে একেবারে গরু-ছাগল-ভেড়া বানিয়ে দিতে পারি, জানিস তুই!
>
> ... 'বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? ঐ দ্যাখ দ্যাখ -' এই ব'লে একটা গরুকে দেখালো। খুব কাছাকাছি গায়ে কালোর ছিটমারা একটা সাদা গরু একমনে ম্যাড় ম্যাড় করে টোঙা চিবাচ্ছিল। বললে, বল তো, ওটা কি? বললাম, 'একটা গরু!'
>
> 'তোর মাথা। ওটা হচ্ছে হরিপদ ঘোষাল। দ্যাখ না এখনো যুগান্তর কাগজের মায়া ছাড়তে পারে নি!... লাগতে আসে আমার সঙ্গে, দিলাম ব্যাটাকে গরু বানিয়ে, এরই নাম মন্ত্রশক্তি! (মাহমুদুল, ২০১০: ৭৬)

এই মন্ত্র-তন্ত্রের প্রসঙ্গ যতই অবিশ্বাস্য হোক পোকারূপী আবদুল খালেকের শিশু মনস্তত্ত্বে এর যে সবিশেষ প্রভাব ছিল তা অনুধাবন করা পাঠকের জন্য কষ্টসাধ্য হয় না।

আবার, উপন্যাসে আরেকটি চরিত্র চিমটেওলা। এক সাধু চরিত্রের সাথে পোকার মায়ের কথপোকথনে উঠে আসে তার অলৌকিক শক্তির পরিচয়। পোকার মা সাধুকে একটা আধুলি দিলে সাধু বলে —

> 'আমি ভিক্ষা নিই না'... 'তোর ঘরে না একটা সিন্দুক আছে কাঠের?'... 'জানি জানি, সবই জানি, না জানলে আর বলছি কিভাবে! তুই একটা বোকা - সাধু হেসে বললে, 'লেপ-তোষক দিয়ে ওটাকে ভরিয়ে রেখেছিস! আমি ইচ্ছে করলে তোর ঐ সিন্দুকটাকে ভরে দিতে পারি -'... 'শুধু একটা ফুঁ! যে টাকায় ফুঁ দেব এক লক্ষ গুণ বেড়ে যাবে।' (মাহমুদুল, ২০১০: ২৬)

সাধুর এই বক্তব্য পাঠককে গোলক ধাঁধার মধ্যে ফেলে দেয়। কিন্তু পরক্ষণেই এই চাতুর্যপূর্ণ আপাত-অলৌকিক ঘটনার অন্তর্নিহিত সত্যকে স্পষ্ট করে তোলেন লেখক খালেকের আত্মকথনের মধ্য দিয়ে —

> মাকে ঠকানো খুব সহজ ব্যাপার ছিল, কেঁদে পড়লেই হলো। চাল-ডাল, পুরনো কাপড়, আলুটা, পেঁয়াজটা বিলানো এসব তো ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। খুব সহজেই মানুষের মুখের কথা বিশ্বাস করে ফেলতো মা। এভাবে প্রায়ই একে-একে বাড়িতে আশ্রয় দিত। তারপর দু'চারদিন যেতে না যেতেই দেখা গেল এটা-ওটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, যথারীতি নতুন মানুষটিও উধাও। (মাহমুদুল, ২০১০: ২৭)

এভাবে লেখক জাদুকরী পরিবেশ থেকে আবার বাস্তবে প্রত্যাবর্তন করেন। লক্ষণীয় যে, আলোচ্য উপন্যাসে বাস্তব ও বাস্তবাতিরেক অনুষঙ্গের সমন্বয়ে কাহিনি যৌক্তিকভাবে এগিয়ে যায় এবং অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় না। আবার কখনো-বা কাল্পনিক উপাদানের মধ্য দিয়ে কাহিনি এমনভাবে উঠে আসে যে সেটাকে মনে হয় একটা প্রপঞ্চ। কোনটা সত্যি, বাস্তব, কোনটা ঘটছে তা একটা ধোঁয়াশার আড়ালে থেকে যায়। মনে রাখা প্রয়োজন যে, আতঙ্কময় ও ব্যাখ্যার অতীত বিভিন্ন অনুষঙ্গ জাদুবাস্তব সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পোকাসত্তার কাহিনিতে এসব উপাদানের সমন্বয় লেখক এক ধরনের যৌক্তিকতার আশ্রয় গ্রহণের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেন। উপন্যাসে পোকার সঙ্গে পাঠকের প্রথম পরিচয় ঘটে একজন অবুঝ শিশু হিসেবে, যে বয়সে সে 'বইপত্তর ছুঁইনি, মাঝে মাঝে কেবল শ্লেটপেন্সিল নিয়ে মাছ আর হিজিবিজি কাগাবগা' আঁকে। তার সামনে যা-ই দৃষ্টিগোচর হয় তাই সে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে। পুঁটির মাছ, গাছ-গাছড়ার সাথে কথা বলা পোকার কাছে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। পোকার কাছে এমন এক বিস্মিত চরিত্র পুঁটি, যে রোজ হাঁড়ি পাতিল ধুতে এসে ঝিনুক দিয়ে চেঁচে চেঁচে দুধের হাঁড়ির পোড়া সর খেত, আর তখনই পুকুরে একটা ধেড়ে মাছ ভেসে উঠলে সে কথা বল শুরু করে দিত —

> 'রাখ তোর হ্যাংলামি আমি একদিন বার করবো, কি ছোঁচারে বাবা – 'বলতাম, 'তোমার কথা বোঝে?'
> 'ওমা, বুঝবে না কেন ।' পুঁটি পড়তো আকাশ থেকে, বলতো, আমিও তো ওর কথা বুঝি। ঐ যে বুড়বুড়ি তোলে, ঐসবই তো ওর কথা। কি বলে জানিস? বলে, ও পুঁটি তুমি কি ভালো মেয়ে, তোমার মুকুটপরা রাজপুত্তুরের মতো টুকটুকে বর হবে, তুমি সোনার পালঙ্কে শুয়ে ঘুমুবে, হাজারগন্ডা দাসী-বাঁদী তোমার পা টিপবে, এখন তুমি আমাকে একটু সরের চাঁছি খেতে দাও— (মাহমুদুল, ২০১০: ১০-১১)

পুঁটি শুধু মাছের সাথে কথা বলে না, মাছও তার সাথে কথা বলে। এ এক চরম বিস্ময় পোকার কাছে। বিস্মিত মন নিয়ে তাই সে পুঁটিকে জিজ্ঞাসা করে —

> সত্যি তুমি সব কথা বোঝ?
> 'সত্যি না তো মিথ্যে! রোজ রোজ কতো আশীর্বাদ করে আমাকে! আর করবে নাই বা কেন, সর খেতে কার না ভালো লাগে! (মাহমুদুল, ২০১০: ১১)

এই আশ্চর্যান্বিত হয়ে যাওয়ার মধ্যে যে জাদুবাস্তব দ্যোতনা রয়েছে তা পাঠকের অনুভূতিতে সংবেদনা জাগায়। একইসঙ্গে এর অন্তস্তলে পুঁটির হৃদয়ের অচরিতার্থতা, মনস্তাত্ত্বিক অসংলগ্নতা পাঠকের অগোচর থাকে না। মাহমুদুল হক জাদুবাস্তববাদী ঔপন্যাসিকদের ন্যায় বাস্তব ও অতিপ্রাকৃতকে একই গুরুত্বে উপস্থাপন করেন এক ধরনের ব্যতিক্রমী যৌক্তিক কাঠামো সৃজনের মধ্য দিয়ে। পরিপার্শ্ব থেকে উৎসারিত যে অপার বিস্ময় প্রতিনিয়ত পোকাকে ঘিরে থাকে তার উপযুক্ত কারণও লেখক ব্যাখ্যা করেন খালেকের আত্মকথনে —

> খুব সম্ভব আমি কমবেশি হাবাগোছেরই ছিলাম। ঠোঙার একটা নকুলদানা পড়ে গেলেও ধুলেমাটি থেকে তা কুড়িয়ে গালে পুরতাম। পুঁটি নামের যে আলতাপায়ে মেয়েটি রোজ আমাদের পুকুরঘাটে গুচ্ছের পেতল কাঁসার থালাবাসন নিয়ে বসতো, সেও আমার কাছে ছিল এক বিস্ময়ের বস্তু। (মাহমুদুল, ২০১০: ১০)

শুধু পোকার দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, উপন্যাসে পুঁটি চরিত্রের উপস্থিতিও পাঠকের মধ্যে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। মাছ, গাছ-গাছড়ার সাথে কথা বলা, গাছের গোড়ায় ঘটি উপুড় করে জল দেওয়া প্রভৃতি কর্মকাণ্ড এক ধরনের অলৌকিকতার আবহ নির্মাণ করলেও লেখক পুঁটির মতো নিম্ন শ্রেণির নারীচরিত্রের মধ্য দিয়ে বিষয়টিকে বাস্তবানুগ করে তোলেন। পোকার সাথে তার কথোপকথনে গ্রাম্য নারী-মনস্তত্ত্বের দিকটি আভাসিত হয়ে ওঠে —

> কি থেকে কি আসে কি থেকে কি হয় তুই তার কি জানিস! সেই যে কাঁঠাল না দেগঙ্গায় শিমুল গাছের গোড়ায়, একঘড়া সোনার মোহর পেয়েছিল এক মুচি, সে-কি আর এমনই, গাছটাকে ভক্তি করতো বলেই তো পেয়েছিল। কম গয়নাগাটি লাগবে বিয়েতে! মাঝে মাঝে তো স্বপ্ন দেখিই, গাছটার গোড়ায় মাটির নিচে এই ইয়া বড় একটা লোহার সিন্দুক, একটা আলসে ময়লি সেটার ভেতর শুয়ে শুয়ে পাহারা দিচ্ছে। (মাহমুদুল, ২০১০: ১১)

প্রসঙ্গত এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে রূপকথার আবহ নির্মাণের যে কৌশল ঔপন্যাসিক গ্রহণ করেছেন তার সমাজতাত্ত্বিক মাত্রাটিও বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। পুঁটির মতো একজন সাধারণ গ্রামীণ কিশোরীর জীবনের যে বাস্তবতা সেই বাস্তবতায় তার অনেক ইচ্ছা-স্বপ্নই পূরণ হওয়া সম্ভব না। তাই সে তার জীবনের অসাধ্যকে সাধন করতে চায় রূপকথার কোনো জাদুকরী শক্তিতে অথবা পেতে চায় কোনো অলৌকিক সহযোগিতা। নিজ চেষ্টা বা নিজ পরিপার্শ্ব থেকে যখন কোনো কিছু পাওয়া সম্ভব হয় না, তখন এক ধরনের অতিপ্রাকৃত শক্তির ওপর এই যে নির্ভরশীলতা তা শিক্ষা-আলোহীন একটি পাড়া-গাঁয়ের মেয়ের মধ্যে থাকাটা অস্বাভাবিক বিবেচিত হয় না। তাই পুঁটি চরিত্রের মধ্যে এক ধরনের অবিশ্বাস্য, উদ্ভটত্বের বিষয় থাকলেও গ্রাম্য পরিবেশের দিক থেকে বিষয়টিকে লেখক বাস্তব করে উপস্থাপন করেন।

নির্দিষ্ট চরিত্রের সহজাত অতিপ্রাকৃত-জ্ঞান জাদুবাস্তব কথাসাহিত্যের অন্যতম বহুচর্চিত বৈশিষ্ট্য। *কালো বরফ* উপন্যাসে এরূপ চরিত্রের সন্ধান মেলে পোকার মনি ভাইজানের বাড়িতে। লোকটি অন্ধ, রোগা-পাতলা ছিপছিপে এবং যার দুটো চোখই পাথরের। কিন্তু তার স্বজ্ঞা এত বেশি প্রবল যে সে মনের চোখ দিয়ে সব কিছু দেখতে পায়। মনি ভাইজান তার কাছে এই শক্তির কারণ জানতে চাইলে লোকটি তাকে ব্যাখ্যা করে বলে —

> চোখের চেয়ে মনের দেখার ক্ষমতা অনেক বেশি, সে অনেক দ্যাখে, অনেকদূর পর্যন্ত দ্যাখে, চোখ যা পারে না। তা তুমি যদি সেই সব দেখতে চাও, তাহলে আগে মনকে খুঁজতে হবে। (মাহমুদুল, ২০১০: ৫০)

অন্ধ লোকটির মধ্য দিয়ে এই অন্তর্জ্ঞানের পরিচয় তুলে ধরে ঔপন্যাসিক এক ধরনের আধিভৌতিক প্রতিবেশ নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। আবার কখনও তিনি সময়ের ধারণাকে পরিবর্তন করার কৌশল গ্রহণ করে চারপাশের চেনা পরিবেশকে অচেনা করে তোলেন। জাদুবাস্তববাদে চকিত সময় বদলের যে নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হয় তার প্রয়োগ লক্ষ করা যায় কালো *বরফ* উপন্যাসে। উপন্যাসের সূচনা ঘটেছে স্মৃতিরোমন্থনের মধ্য দিয়ে —

> তখন আমার বয়স ছিল বুড়ো আঙ্গুল চোষার, কখনো পুকুর ঘাটে, কখনো বারান্দার সিঁড়িতে, কখনো-বা জানালায় একা একা বসে কেবল আঙ্গুল চুষতাম। আঙ্গুলের নোনতা স্বাদ যে খুব ভালো লাগতো, ঠিক সেরকম কোন ব্যাপার নয়। তখন ভালো লাগা বা মন্দ লাগা এসবের কোন ঝক্কি ছিল না,... (মাহমুদুল, ২০১০: ৯)

প্রথম পরিচ্ছেদের এই বর্ণনারীতি পাঠককে অতীতে নিয়ে যায়। কিন্তু তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষে এসে হঠাৎ করে উল্লম্ফনধর্মিতার মধ্য দিয়ে যখন বর্ণিত হয় — 'সেসব কতো কথা। ইচ্ছে করলেও এখন আর সব মনে পড়ে না। কতো কথা, কতো চার ভাঁজ-করা ছবি, তেশিরা কাচ, লালকুঁচ, কতো সকাল-দুপুর-বিকেল বোকার মতো হারিয়ে ফেলেছে পোকা! কখনো মনে হয় নি, একদিন সবকিছুর আবার খোঁজ পড়বে নতুন করে। বড় অবহেলা ছিল পোকার, বড় অবহেলা' (মাহমুদুল, ২০১০: ৩৭) — তখন সে বর্ণনার মধ্য দিয়ে পাঠক বর্তমানে ফিরে আসে। এই অতীত আর বর্তমানের খেলা পুরো উপন্যাসে পৌনঃপুনিকভাবে চলতে থাকে। শুধু সময় নয়, স্থান-ধারণাও ভেঙে যায় এ উপন্যাসে বারবার। *কালো বরফ* উপন্যাসে স্মৃতি রোমন্থনের মধ্য দিয়ে আবদুল খালেক বর্তমানের বেদনাজর্জর জীবনকে আড়াল করতে পোকা জীবনের মধ্যে চলে যেতে চায়। এর মধ্য দিয়ে বাস্তবের কাঠামো পাল্টে গিয়ে স্থান পরিবর্তিত হয়ে যায়।

জাদুবাস্তবতার ধারায় রচিত উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে গিয়ে কুডন (Cuddon, 1992: 522) প্রকাশবাদী ও পরাবাস্তববাদী বর্ণনার কথা বলেছেন। আলোচ্য উপন্যাসে এ বৈশিষ্ট্যটি খুবই সীমিত আকারে পরিলক্ষিত হয়। পোকা সত্তার মধ্য দিয়ে শৈশবস্মৃতির বিলীন হয়ে যাওয়া এবং তার জন্য আবদুল খালেকের নৈসঃঙ্গ্যবোধ, ভেতরের যন্ত্রণাকে বাস্তব বিবরণ প্রদানের পরিবর্তে লেখক আশ্রয় করেছেন প্রকাশবাদী ও পরাবাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি —

> অযত্ন আর অবহেলায় কত কিছুই যে সে হারিয়ে ফেলেছে! জিনজার এখন গানের মতো বাজে, হিনজার এখন বুকের ভেতর নিরবিচ্ছিন্ন শব্দ তোলে। হু হু বাতাসের গায়ে নকশা-তোলা ফুলের মতো অবিরল আকুলতা, পোকার বুকের ভেতরের ফাঁকা দালানকোঠা গুম গুম করে বাজে, "পোকা তুই মর, পোকা তুই মর!"
>
> যা কিছু নিঃশব্দ, যা কিছু শব্দময়, যা কিছু দৃষ্টিগোচর, দৃশ্যাতীত, সবকিছু একজোট হয়ে হাত ধরাধরি করে ঘিরে ধরে; অদ্ভুত এক বাজনার তালে তালে আস্ত একটি রাত মোমের মতো গলে পড়ে, জিনজার-হিনজার জিনজার-গিনজার পোকা শোনে, শুনতে পায়। পোকা পোকা হয়ে যায়। (মাহমুদুল, ২০১০: ৩৭-৩৮)

মাহমুদুল এখানে তাঁর জাদুবাস্তব শিল্পকৌশলকে বহুলাঙ্গ করে তোলার লক্ষ্যে পোকার দগ্ধ জীবনচৈতন্যকে আঁকেন সাহিত্যিক প্রকাশবাদের সূক্ষ্ম তুলির আঁচড়ে; আর এর সঙ্গে রং মেলানোর মতো করে মিলিয়ে দেন পরাবাস্তববাদী রংহীনতার শেড। ফলে, তাঁর এ বিবরণ লাভ করে বিশিষ্ট নান্দনিকতা; আর এভাবেই ছোট ছোট বাক্যবন্ধের ব্যতিক্রমী বর্ণনারীতির মধ্য দিয়ে পোকা আর আবদুল খালেককে দ্বন্দ্বের মুখোমুখি করে তুলে এক সামগ্রিক প্রতিবেদনের (total effect) সঞ্চার ঘটান ঔপন্যাসিক। কখনও আবার অতি উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা অত্যন্ত নিরাসক্তভাবে কিংবা একেবারেই বিপরীত আবেগ প্রকাশের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করা মাহমুদুল হকের বাগভঙ্গিমার অন্যতম বিশেষ নৈপুণ্য যা জাদুবাস্তবতার বৈশিষ্ট্য। *কালো বরফ* উপন্যাসে খালেক ও রেখার দাম্পত্যকলহের মধ্য দিয়ে এই বৈশিষ্ট্যটি উঠে আসে। সংসার জীবনে অভাব-অনটন, আর্থিক-দৈন্য থেকে প্রায়শই খালেক ও রেখার মধ্যে কলহের সূত্রপাত হয়। একদিকে খালেকের শিক্ষকতা পেশায় স্বল্পবেতন, অন্যদিকে সংসারের প্রতি তার উদাসীনতার কারণে ক্ষুব্ধ রেখা যখন খালেককে অভিযোগের সুরে কটু ভাষায় বলে —

> এটা কোনো জীবন! কান্নায় ভেঙে এলো রেখার গলা। বললে, 'ইচ্ছে করে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়ি। এমন একটা মানুষ নেই, যার সঙ্গে দু'টো কথা বলি। জঙ্গলের ভেতরে দিনের পর দিন তুমি আমাকে পচিয়ে মারছো, এইভাবে আমাকে শাস্তি দিচ্ছ!' (মাহমুদুল, ২০১০: ১৮)

তখন খালেকের প্রত্যুত্তর উঠে আসে সম্পূর্ণ বিপরীত ধারায় এক গভীর রোম্যান্টিক আবেদন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে —

> এতো দূর থেকে কথা বলো কেন, তুমি কিন্তু তোমার মনের শান্তি নিজেই নষ্ট করেছো এভাবে, তোমার সঙ্গে আমার কিসের শত্রুতা? শাস্তির কথা ওঠে কেন? আমি লোকটা এতোই খারাপ, এতোই চণ্ডাল! (মাহমুদুল, ২০১০: ১৮)

লেখকের এই উপস্থাপন কৌশলের মধ্য দিয়ে একটা সিরিয়াস মুহূর্তকে লঘু করার প্রবণতাও লক্ষণীয়। এখানে বর্ণনাভঙ্গিতে বাস্তবতা ক্ষুণ্ণ হয়নি; বরং এ কলহ থেকেই রেখার-খালেকের সম্পর্কটা নতুন করে মধুর পরিণতিতে পৌঁছে যায়।

শেষকথা

মাহমুদুল হকের *কালো বরফ* উপন্যাসে জাদুবাস্তব অনুষঙ্গ অনুসন্ধান করে বলা যায় উপন্যাসটিতে এই বিশিষ্ট শিল্প প্রকৌশলটি বহুমাত্রায় সন্নিবেশিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সামগ্রিক উপন্যাসের শিল্পগঠন জাদুবাস্তব নয়। যে সমাজ, যে সময়ে বসে মাহমুদুল এই উপন্যাস লিখেছেন তা-ই যেন তাঁকে এরূপ বহুমাত্রিক অথচ সীমিত পরিসরে জাদুবাস্তব অনুষঙ্গসমূহকে বিন্যস্ত রাখতে অনুপ্রাণিত করেছে। আবদুল খালেকের লুণ্ঠিত শৈশবকে জাদুবাস্তব আবহে আপাতভাবে ফিরে পাওয়ার একটি প্লাটফর্ম তৈরি করে দিতে চেয়েছেন মাহমুদুল। অবপ্রাণীর মোড়কে ঢেকে রেখে খালেকের শৈশবকে তিনি করে তুলেছেন

প্রাকৃত-অতিপ্রাকৃতের সীমা-অতিক্রমী জাদুর স্পর্শমাখা এক সুগভীর সংবেদনা; যা খালেকের বর্তমানকে বারবার ভেঙেছে, বর্তমানের করাল-দংষ্ট্রা রূপকে প্রকট করে তুলেছে অনুপুঙ্খভাবে। খালেকের বর্তমান জীবন নিয়ে কোনো জাদুবাস্তব প্রসঙ্গের অবতারণা করার সুযোগ লেখকের ছিল না; কিন্তু লেখক তো জাদু দিয়ে সময়কে বাগে পেতে চান। তাই মনসিজ লেখনীকে সময়-কল বানিয়ে তিনি খালেকের পোকা সত্তাকে আবিষ্কার করেন, এই সত্তার মাহাত্ম্যকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। আবদুল খালেক ও পোকার সময় এবং জীবনার্থের দ্বন্দ্বকে পাঠকের বোধের কাছে সমর্পণ করেন। তাই বলে শিল্পীর দায় তিনি বিস্মৃত হন না। এ কারণেই পোকা জীবন থেকে বেরিয়ে এসে আবদুল খালেকের বর্তমানের জীবনে উঁকি দিয়ে বাস্তব ও বাস্তবাতিরেকের মধ্যে ভারসাম্য রচনা করেন। আর এভাবেই এক ব্যতিক্রমী নান্দনিক মীমাংসায় পৌঁছতে আগ্রহী হন মাহমুদুল হক।

সহায়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

অমিয়ভূষণ মজুমদার, ২০০৮। 'মহিষকুড়ার উপকথা', *অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র ৬,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ।

মাহমুদুল হক, ২০১০। *কালো বরফ,* সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা ।

রবিউল হুসাইন, ২০১০। 'একজন শব্দ-ভাস্কর, মাহমুদুল হক', আবুল হাসানাত, মফিদুল হক,

আবু হেনা মোস্তফা এনাম সম্পাদিত *আলো ছায়ার যুগলবন্দি মাহমুদুল হক স্মরণে,* সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২০১৬। 'কঙ্কাল', সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত *রবীন্দ্র-রচনাবলি,* চতুর্দশ খণ্ড, ঐতিহ্য, ঢাকা।

সৈয়দ আজিজুল হক, ২০১০। 'মাহমুদুল হকের *কালো বরফ:* উন্মুলিত সত্তার জীবনযন্ত্রণা', আবুল হাসানাত, মফিদুল হক, আবু হেনা মোস্তফা এনাম সম্পাদিত *আলো ছায়ার যুগলবন্দি মাহমুদুল হক স্মরণে,* সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা ।

Carpentier, Alejo, 1998. 'On the Marvelous Real in America', *Magical Realism: Theory*, *History, Community.* [Ed. Lois Parkinson Zamora & Wendy B. Faris], Duke University press, Dhurham and London.

Cuddon, J. A, 1992. *Dictionary of Literary terms and literary theory*, perguin Books, England.

Kaushik Trivedi, 2013. Magic Realism: A Genre of Fantasy and Fiction, *International Journal Of English and Education;* ISSN: 2278-4012, volume: 2, Issue: 3, JULY 2013. Department of Communication Skills, Charotar University of Science & Technology, Gujarat.

Maggie Ann Bowers, 2004. *MAGIC (AL) REALISM*, Routledge, London And New York.

Stephen slemon, 1998. Magic realism and post-colonial discourse, *Magical Realism*: *Theory, History, Community*, [Ed. Lois Parkinson Zamora & Wendy B.Faris], Duke University press, Dhurham and London.